بسم الله الرحمن الرحيم

সোনাইমুড়ীতে বারবার হামলার নেপথ্যে

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত
একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন

hezbuttawheed.org

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا
بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

আল্লাহ বলেছেন- মো'মেনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও (আল কোর'আন: সুরা হুজরাত-৬)।

সোনাইমুড়ীতে হেযবুত তওহীদের উপর বারংবার হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

২০০৯ সনে হেযবুত তওহীদের সদস্য ইসমাইলের আধাপাকা নতুন বাড়িটি লুটপাট করে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

সম্মানিত সুধী,

সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আজ এমন এক সত্যের আদ্যপান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যে সত্য পরিকল্পিতভাবে চাপা দেওয়া হয়েছিল। ফলে মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে, ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে, গুজব রটিয়ে এত বড় অন্যায় সংঘটিত হওয়ার পরও তা সবার সামনে সঠিকভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি।

আমার বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানাধীন পোরকরা গ্রামে। আমাদের বাড়িতে এবং আশেপাশের

কয়েকটি বাড়িতে বারবার হামলা চালানো হয়েছে। বড় ধরনের হামলা চালানো হয়েছে চারবার। এই হামলাগুলো কারা চালিয়েছে, কেন চালিয়েছে, তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কী ছিল ইত্যাদি জানার অধিকার আমার দেশের মানুষের রয়েছে। কারণ পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করার প্রবাদ সকলের জানা। হেযবুত তওহীদকে ইস্যু বানিয়ে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করে এই এলাকার পরিস্থিতি ঘোলাটে করে আমাদের বাড়িঘর লুটপাট, জমি দখল, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা-নির্যাতন করা হয়েছে। **আবারো তারা ঐরকম একটা ঘটনা ঘটানোর পাঁয়তারা করছে।** সেজন্য আমি আপনাদের সামনে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাগুলোর নেপথ্য কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

২০০৯ সনে আমাদের বাড়িটি (নুরুল হক মেম্বারের বাড়ি) লুটপাট করার পর সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

জ্ঞান হবার পর থেকে আমি মনে প্রাণে চাইতাম, আল্লাহ রসুলের ইসলাম সমাজে কার্যকর হোক। আল্লাহর দীন ইসলামের আদর্শ মোতাবেক আমাদের সমাজ পরিচালিত হোক। কলেমা তওহীদের উপরে মুসলমান জাতি ঐক্যবদ্ধ হোক। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আমি সম্পৃক্ত থাকতাম। আলেম ওলামাদের সঙ্গে দীনের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম, তাদের সাহচর্য সব সময় চাইতাম। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে জানা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ি তখনও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, আলেম ওলামা, সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে গিয়েছি। এমনকি ইসলামের উপর, মুসলমানদের উপর কোনো আঘাত আসলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছি। কারণ ইসলাম আমার চেতনায়, আমার চিন্তায় সদা জাগরুক ছিল, আর আমি একে কর্মে পরিণত করার চেষ্টা করতাম।

শিক্ষাজীবন শেষে আমার মনে একটি অনুভূতি জাগ্রত হলো, এই সমাজে আমি তিলে তিলে বড় হয়েছি, এই দেশ, মানুষ ও সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করার দায়বদ্ধতা আমার রয়েছে। তাই আমার শিক্ষা, অর্থ, সামর্থ্য ও শ্রমকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করব। দেশের নাগরিক হিসাবে এটি যেমন আমার সামাজিক কর্তব্য, তেমনি একজন মো'মেন মুসলিম হিসাবে এটা আমার ঈমানি কর্তব্য। কারণ একজন মানুষ হিসাবে আমি আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি (সুরা বাকারা ৩০)। সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই আমি সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনের সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হলাম। আমি বিশ্বের দিকে তাকিয়ে

২০০৯ সনে এভাবেই হেযবুত তওহীদের সদস্য আব্দুল আজিজের বাড়িটি ভেঙে মালামাল লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়।

দেখলাম, দুনিয়াময় মুসলমান জাতির উপর অন্যায়, অত্যাচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একে একে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, বসনিয়া, চেচনিয়া, মিয়ানমার, আরাকান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশসহ যেখানেই মুসলিম আছে সেখানেই তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে, তারা হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে, লাখে লাখে উদ্বাস্তু হচ্ছে। এক কথায় সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। মুসলমান জাতির তো এ অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। এক সময়ের শ্রেষ্ঠ জাতি, ঐক্যবদ্ধ জাতি আজ নিগৃহীত ও বিভক্ত কেন?

তাছাড়াও আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি। আমাদের সমাজে অন্যায়, অশান্তি, সুদ-ঘুষ, মাদক, অপরাজনীতি, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি হওয়ার কথা নয়। অথচ এসব অন্যায় অবিচারে আমাদের সমাজ পূর্ণ। অর্থাৎ বাহিরে খাচ্ছি অন্য জাতির মার, আর ভিতরে নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি। আমি এই দুরবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে থাকি। পূর্বেই বলেছি, আমি পথের সন্ধানে বহু ইসলামী দল, চিন্তাশীল ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখের কাছে যাই। জানা-বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু আমি যা চেয়েছি এবং যে উপায়ে চেয়েছি সেটা পাইনি। অবশেষে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংস্পর্শে যাই। এখানে তাঁর সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললেই নয়।

ইতিহাসের বইতে পড়েছি সুলতানি আমলে গোটা ভারতবর্ষে ইরানি, আফগানি, তুর্কি সুলতানগণ শাসন করতেন। এমনই একটি রাজপরিবার (Dynasty) ছিল কররানি রাজবংশ যারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামসহ বিস্তীর্ণ এলাকার শাসক ছিলেন। এই পরিবারেরই শেষ সুলতান ছিলেন দাউদ খান কররানী যিনি ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগল বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেন ঐতিহাসিক রাজমহলের যুদ্ধে। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা এই অঞ্চল দখল করে নেওয়ার পরও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই পরিবার দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছে। অত্র অঞ্চলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় এক কথায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসারে, মুসলমানদের অগ্রসর

সকাল থেকেই শুরু হয় হামলার প্রস্তুতি ও লোকসংগ্রহের কর্মসূচি, উস্কানিমূলক শ্লোগান দিয়ে উত্তপ্ত করে তোলা হয় পরিস্থিতি। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহও ছিলেন পন্নী পরিবারের জামাতা। ১৯১২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি ঢাকার রমনা এলাকায় নিজ ৬০ একর জমিসহ ১,৮৬,৯০০ টাকা দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন মহামান্য এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান মন্ত্রী হিসাবে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে অর্থাভাব দেখা গেলে নিজ জমিদারীর একাংশ বন্ধক রেখে এককালীন ৩৫,১৫০ টাকা প্রদান করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন"-টি তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। করটিয়ার জমিদার হিসাবে বিখ্যাত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে আজও বহু স্থাপনা তাদের নামে রয়েছে যেগুলোতে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যাহোক, সেই জমিদারি ব্যবস্থা এখন নেই। সেই পরিবারের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের ক'জনই বা জানে। সেই সুলতানী বংশেরই উত্তরপুরুষ জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী যাঁর ধমনীতে যেমন ইসলামের জন্য লড়াই করার চেতনা ছিল, তেমনি ছিল মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা।

তাঁর কথা শোনার পর এবং তাঁর লেখা বই পড়ার পর আমার সামনে সেই মুক্তির পথ সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল। আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের মুসলমান জাতির ইহজগৎ ও পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ - তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া আর কারো হুকুম বিধান (আদেশ-নিষেধ) মানবো না, আল্লাহ যেটাকে ন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন সেটাকে ন্যায়, যেটাকে অন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন সেটা অন্যায় বলে বিশ্বাস করব এবং মেনে নেব। অর্থাৎ যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর শেষ রসুলের (সা.) কোনো কথা আছে সেখানে অন্য কারো কথা মানবো না। এটাই হচ্ছে তওহীদের ঘোষণা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.)" এর প্রকৃত দাবি। আমাদের প্রভু একজন আল্লাহ, রসুল একজন মোহাম্মদ (সা.), কেতাব একটি আল কোর'আন, স্বভাবতই জাতিও হবে একটি অখণ্ড জাতি, ঐক্যবদ্ধ জাতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে মুসলমানদের মধ্যে ছোটখাটো বিষয়ে মতের অমিল নিয়ে বহু ফেরকা, মাজহাব, তরিকার বিভক্তি বিরাজ করছে। ফলে আমরা কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না এবং নিজেদের সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, অনাচার

"খ্রিষ্টান মারো গির্জা ভাঙ্গো" এই স্লোগান দিতে দিতে মিছিল নিয়ে জড় হয় ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের দাঙ্গাবাজ ধর্মান্ধ অনুসারীরা। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

দূর করতে পারছি না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল জাতির হাতে মার খাচ্ছি, অপমান, লাঞ্ছনা, পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছি। এ অবস্থা থেকে নিস্তারের শর্তই হচ্ছে পুরো জাতিকে যে কোনো মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এই ঐক্যের একটি মাত্র সূত্র আল্লাহ দিয়েছেন- তা হলো তওহীদ তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.) "- এর অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকা। আমরা সবাই যদি কলেমা, তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতি হতে পারব।

শেষ নবী (সা.) এর রেখে যাওয়া কোর'আনের একটা বর্ণও কেউ বিকৃত বা পরিবর্তন করতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না ইনশাল্লাহ। তিনি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আরবের জাহেলিয়াতের সমাজকে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক সেই মহান আদর্শের দ্বারা শান্তি ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ একটি সমাজে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। ইতিহাস বলে, সেই সমাজের মানুষ ছিল পরস্পর হানাহানি, শত্রুতা, মারামারিতে লিপ্ত। তারা পরস্পর ভাই হয়ে গেল। নারীদেরকে সেখানে ভোগের সামগ্রী গণ্য করা হতো, মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই নারীরা সকল ক্ষেত্রে সম্মানিত হলেন। জাতির সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সকল সামষ্টিক কাজে তারা তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত রসুলাল্লাহ (সা.) নারীদেরকে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঘরে চলত মদ্যপান। সেই মদ্যপান বন্ধ হয়ে গেল। চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি ছিল নিত্ত-নৈতিত্তিক ঘটনা। সেগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে ঘরে বাহিরে নিরাপত্তা আসলো। একা একটা মেয়ে মানুষ শত শত মাইল পথ অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে হেঁটে যেত, তার সম্মান বা সম্পদ হারানোর কোনো ভয় ছিল না। দাসত্ব ব্যবস্থা দূর হয়ে মানুষ মুক্তি পেল, স্বাধীনতা পেল। বেলালের (রা.) মতো চরমভাবে নিগৃহিত বঞ্চিত ক্রীতদাসকে রসুলাল্লাহ (সা.) কাবার উপরে উঠিয়ে আযান দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিলেন, কোনো বংশ গৌরবের আভিজাত্য নেই, সাদা কালোর কোনো ভেদাভেদ নাই। ইসলাম এসেছে মানবতার মুক্তির জন্য, মানুষকে জাহেলিয়াতের কলুষতা থেকে পবিত্র করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করার জন্য। এসব ইতিহাস আজকে গল্পের মতো মনে হয়। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি শান্তিময় সমাজই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাহলে আমরা কী বুঝলাম? **এটা প্রমাণিত যে, প্রকৃত ইসলামের আদর্শ একটি সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে, ইসলাম একটি দুর্বল জাতিকে সেরা জাতি বানাতে পারে, ঐক্যহীন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। যেটা আখেরি নবী (সা.) করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা বলতে চাই, আজকেও একইভাবে আমাদের জাতিকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, প্রযুক্তিতে পৃথিবীর সেরা জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম ইসলাম।** কিন্তু

আব্দুস সোবহানের বাড়িটি লুটপাট করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। অবশেষে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মব্যবসায়ীদের এই বর্বরতা যেন একাত্তরের হানাদার পাক বাহিনীর হামলাকেও হার মানিয়েছে। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে এই, আমরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান প্রত্যাখ্যান করে মেনে চলছি পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা'র তৈরি জীবনবিধান। হেযবুত তওহীদের আহ্বান হচ্ছে, সেই সত্য দীনে আবার প্রত্যাবর্তন করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের এই ডাকে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানত দু'টো শ্রেণি। এক) ধর্মব্যবসায়ী একটি গোষ্ঠী, দুই) ইসলামবিদ্বেষী আরেকটি গোষ্ঠী। এই উভয় শ্রেণির বহুমুখী অপপ্রচার ও বিরোধিতার ফলে সমাজে আমাদের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি আরবীয় লেবাস সুরত ও আরবী ভাষা ব্যবহার করে মানুষের কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করছে। নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা চায় না এমন কোনো সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, যে সমাজে ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যবসা করা, স্বার্থ হাসিল করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি ও অপরাজনীতি করা সম্ভব হবে না। তাদের একটাই চাওয়া- মানবজাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবীর যে পরিস্থিতিই হোক, তাদের ধর্মভিত্তিক জীবনজীবিকা যেন টিকে থাকে, এটায় যেন কোনো আঁচড় না লাগে। এই ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফেরকাবাজি, দ্বন্দ্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। **কিন্তু চিরন্তন সত্য - হলো ধর্মের মধ্যে যখন কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িয়ে যায়, বিনিময় জড়িয়ে যায় তখন সেই ধর্ম স্বকীয়তা হারায় এবং বিকৃত হয়ে যায়। বহু হারাম জিনিসকে হালাল বানানো হয়, বহু বৈধ জিনিসকে অবৈধ করা হয়। বহু ছোটখাটো বিষয়কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ধর্মকে কঠিন বানিয়ে ফেলা হয়, দীনের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়।** আজকে ইসলামের বেলায় সেটাই হয়েছে। আল্লাহর সরাসরি আদেশ-নিষেধ অর্থাৎ ফরজ মান্য করা হচ্ছে না, অথচ সুন্নত নফল মুস্তাহাব ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি, তর্ক বিতর্ক বাহাসের শেষ নেই। এসব বাহাস বিতর্ক করে জনগণকে হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষ, যাদের ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা বা আকিদা নেই কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিপ্রবণ, তাদের এই ধর্মানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছে একটি ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তারা ধর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ হাসিল করে, ওয়াজ করে, কোর'আন খতম করে, মুর্দা দাফন করে, মিলাদ পড়িয়ে ইত্যাদি নানারূপ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কাজ করে দিয়ে মানুষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু দীনের কোনো পার্থিব বিনিময় চলে না। আল্লাহ বলছেন রক্ত, শুয়োর, মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, তারপর বলছেন নিরুপায় হলে তাও খেতে পারো (সুরা বাকারা ১৭৩)। কিন্তু দীনের বিনিময়

নেয়া একেবারে হারাম যার কোনো ক্ষমা নেই। সুরা বাকারার ১৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ
بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

"আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা-(১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না,(২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না,(৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও করবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী ক্রয় করেছে, (৬) তারা দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে,(৭) আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল"। আর সুরা ইয়াসিনের ২১ নম্বর আয়াতে তিনি এও বলেছেন,

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

"তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে বিনিময় আশা করে না এবং যারা সঠিক পথে আছে।"
এই সত্য কথাগুলো আমি যখন আমার নিজ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে বলতে শুরু করলাম তখন আমার প্রধান বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো সেই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি। তারা দেখল যে, এই সত্যগুলো যদি মানুষ জেনে যায় তাহলে তো তাদের সকল ধর্মব্যবসা, আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের আরেকটি অংশ যারা ইসলামের নাম করে ধান্ধাবাজির রাজনীতি করে, যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জেহাদ বলে চালিয়ে বেড়ায় তারাও সক্রিয় হয়ে উঠল আমাদের বিরোধিতায়। তারা দেখল যে হেযবুত তওহীদের বক্তব্য যদি মানুষ জানে তাহলে ইসলামের নামে চালু করে রাখা অনৈসলামিক কার্যক্রম তারা আর চালিয়ে যেতে পারবে না। এই দুটো ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী একজোট হয়ে আমার মুখ বন্ধ করার জন্য আমার বিরুদ্ধে নানা বানোয়াট, মিথ্যা কথা প্রচার (Propaganda) করতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল, আমরা নাকি টাকার জন্য উরুতে সিল দিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছি; আমরা নাকি মুর্দাকে কালো কাপড় দিয়ে মাটি দেই; বসিয়ে কবর দেই; পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ি; আমি কোরআন শরিফকে অস্বীকার করেছি, পর্দার বিধান মানি না (নাউযুবিল্লাহ)।
আরো এমন সব উদ্ভট উদ্ভট মিথ্যা তারা আমাদের নামে বলে যেতে লাগল যেটা কোনোদিন আমাদের আত্মাও জানে নাই। এসব মিথ্যাগুলো বলার জন্য তারা ব্যবহার করলো মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি ধর্মীয় পরিমণ্ডল। তারা আমাদের সমাজে 'আলেম', 'মওলানা', 'মুফতি' হিসাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তারা যখন কোনো কথা বলে তখন সেটাকে মানুষ অন্ধভাবে সত্য বলে মেনে নেয়। আমাদের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটল। মানুষ আমাদেরকে কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই 'খ্রিষ্টান' বলে বিশ্বাস করে নিল, আমাদের বাড়িকে 'খ্রিষ্টান বাড়ি' বলে অভিহিত করতে লাগল। এটা কেবল অপপ্রচারের মধ্যে সীমিত রইল না, ধর্মব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের বড় মাদ্রাসা থেকে লিখিত ফতোয়াও দিয়ে দিলেন যে আমরা নাকি কাফের, মুরতাদ। তাদের নির্দেশে আমাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হলো। মসজিদে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আমাদের সাথে কেউ কথা বলবে না, আমাদের সাথে কেউ কাজ করবে না, হাটে বাজারে মারধোর গালিগালাজ চলতে থাকল। আমাদের কাছে কোনো দোকানদার পণ্য বিক্রি করত না, আমাদের ক্ষেতে খামারে কেউ কাজ করত না, আমাদেরকে কেউ পানি পর্যন্ত দিত না। এক যোগে চালু করে দেওয়া ভয়াবহ অপপ্রচারের ফলে আমরা একঘরে হয়ে পড়লাম। গ্রামীণ সমাজে কোনো পরিবারকে বয়কট বা একঘরে করা হলে তাদের জীবন কী দুর্দশার মধ্যে পড়ে সেটা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু আমরা সত্যের উপর অটল থাকলাম এই আশা নিয়ে যে, ইনশাল্লাহ একদিন গ্রামবাসীর ভুল ধারণা অবশ্যই ভাঙবে। আমরা যে সত্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি তা মানুষ দেখবে।
প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়। এই অপপ্রচারের সুযোগ নিল আমাদের গ্রামের চার-পাঁচটি স্বার্থান্বেষী পরিবার যারা বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আমার বাবা নুরুল হক মেম্বারের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছিল। এই কয়টি পরিবারের শত্রুতা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ইস্যুতে ছিল না। তাদের ইস্যু ছিল পূর্ব গ্রাম্য শত্রুতা। চারদিকে যখন তুমুল অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র শুরু হলো তখন ঐ গ্রাম্য শত্রুরা তাদের প্রাচীন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মওকা পেয়ে গেল। আমাদের বিরোধিতাকে তারা অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, লোকবল দিয়ে সহযোগিতা করে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে ফেলল। তারা চাইল এই সুযোগে

এভাবেই হাতে রড-কিরিচ নিয়ে প্রকাশ্যে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। এগুলো দিয়েই জবাই করা হয় হেযবুত তওহীদের দুই সদস্যকে। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

আমাদেরকে আমাদের গ্রাম থেকেই উৎখাত করে দেবে এবং আমাদের সহায়-সম্পত্তি যা আছে তা নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে। এজন্য গ্রামে যারা ইউনিয়ন পরিষদের রাজনীতি থেকে শুরু করে সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকেও জড়িয়ে নিল যেন দলভারী হয়। **কী ঘটছে আর কী ঘটতে যাচ্ছে সবই আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। আমরা সেই বিষয়গুলো বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে কখনও জিডি করে, কখনও স্মারকলিপি প্রদান করে, কখনও মৌখিকভাবে জানালাম। কিন্তু সে সময়ের স্থানীয় প্রশাসন অর্থ, সংখ্যার আধিক্য ও পেশীশক্তির কাছে নত ছিলেন। তারা দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ না নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সঠিক তথ্য না দিয়ে ভুল পথে চালিত** (Misguide) **করলো।** আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ধর্মব্যবসায়ী ও

এই জায়গাটিতে মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছিল। আংশিক নির্মিত মসজিদটিকে গুড়িয়ে দিয়ে সেই ইটগুলি ভেঙে একযোগে হামলা চালানো হয়, আহত রক্তাক্ত করা হয় নির্মাণ শ্রমিকদের এবং বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যদের। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

ষড়যন্ত্রকারীরা কী ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু থানা প্রশাসন তাদের উর্ধ্বতন প্রশাসনকে সেই ভয়াবহতা অনুধাবন করতে দিল না। বলল যে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে, ফলে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের আর্তিকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না।

নানাদিক থেকে আমাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে কোণঠাসা করার পর, মিথ্যা রচনা করে আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার পর শুরু হলো সরাসরি আক্রমণ।

২০০০ সাল। মসজিদে মসজিদে ওয়াজ করে মুসল্লিদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা হলো। তারপর দিন তারিখ নির্ধারণ করে চাষীর হাট নতুন বাজার মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজের পর মিছিল নিয়ে এসে শুরু হলো সন্ত্রাসী হামলা। মিছিলের শ্লোগান ছিল, "হেযবুত তওহীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও", "একটা একটা তওহীদ ধর, ধরে ধরে জবাই কর" ইত্যাদি। সারারাত ধরে আমাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। রেললাইন আর মহাসড়কের পাথর ছুঁড়ে আমাদের বাড়ির টিনের চাল গুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেসময় তারা আমাকে হত্যা করতে পারে নি। স্থানীয় প্রশাসন সেদিন কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি। উল্টো তাদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আমাদের নামে পরদিন ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা গ্রহণ করল। দীর্ঘদিন ধরে অবর্ণনীয় হয়রানির শিকার হওয়ার পর সেই মামলায় আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হই। সামাজিক লাঞ্ছনা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অপমান, গালিগালাজ, বয়কট ইত্যাদি তো চলতেই থাকে নিয়মিতভাবে। কোথাও কারো কাছে আমরা কোনো সুবিচার পাই না। ধর্মব্যবসায়ী ও চিহ্নিত কয়েকটি পরিবারের প্রচারিত মিথ্যাগুলো বিনা প্রমাণেই যেন সত্য বলে কায়েম হয়ে গেছে।

২০০৩ সালে আবারও হামলার শিকার হয় হেযবুত তওহীদের কয়েকজন সদস্য। এরপরের কয়েক বছর বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে মারধোর, আক্রমণ চালানো হয়। রাসেল নামে এক বালককে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে পেটানো হয়। রহমত উল্লাহ, মোবারক, ইমাম হোসেন নামে তিনজন সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে সোনাইমুড়ী বাজারে গাছে ঝুলিয়ে পেটানো হয়। সোনাইমুড়ী রেল স্টেশনে সোনাইমুড়ীর দায়িত্বশীল মোমিন উল্লাহকে আক্রমণ করে আহত রক্তাক্ত করা হয়। আমার ছোট ভাই মাইনুদ্দিনকে বাস থেকে নামিয়ে নির্যাতন করা হয়। চার/পাঁচ বছর ধরে এরকম বিচ্ছিন্ন হামলা ও নির্যাতন চলতে থাকে। আমাদের জীবন অতীষ্ঠ; পৃথিবী সংকীর্ণ; যেন মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। অনেক সদস্য বিদেশে পাড়ি জমালেন এ নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য। এই কয়টি পরিবারের যে সমস্ত মেয়েদেরকে আশপাশের গ্রামে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে পর্যন্ত গিয়ে তাদের শ্বশুরবাড়ির মানুষকে প্রভাবিত করে তাদের নির্যাতন করা হলো এবং সংসার ভাঙার চেষ্টা করা হলো। আমাদের আত্মীয় স্বজন- যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়,

শেষবারের হামলায় বাড়ির সকল সদস্যকে আহত রক্তাক্ত করার পর ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র লুট-পাট করার পর পুলিসের সামনেই পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয় আমার বাড়িটি। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

তাদের উপরও চলল নির্যাতন। তারাও ধর্মব্যবসায়ীদের নির্যাতনের প্রত্যুত্তর দিতে না পেরে আমাদের উপর পারিবারিকভাবে চাপ দিতে থাকল।

২০০৯ সন। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আমাদের বাড়িতে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল করি। অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধবাদীদের ভিতরে আবারও অন্তর্জ্বালা শুরু হয়। আবারও তারা হামলা করে এলাকা থেকে আমাদেরকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। **যে কোনো হামলার জন্য প্রয়োজন হয় পটভূমি নির্মাণের। এজন্য পুনরুদ্দমে সহিংসতার পটভূমি তৈরির জন্য দিনের পর দিন চলতে থাকে খুতবা ও মাহফিলের মধ্যে বিদ্বেষপ্রচার ও গুজবের ছড়াছড়ি।** ঢাকার সূত্রাপুরের একটি মাদ্রাসা থেকে মুফতি ভাড়া করে এনে চাষীর হাট বাজারে ওয়াজ করানো হয়। সেই ওয়াজে সরাসরি হামলা করার জন্য উস্কানি ও ফতোয়া দেওয়া হয়। পটভূমি প্রস্তুত হলে ৯ মার্চ ২০০৯ তারিখ সকাল থেকে মসজিদের মাইকে শুরু হয় হামলা করার নির্দেশ। হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোটা, তলোয়ার, কিরিচ, রেল লাইনের পাথর, মাছ মারার ট্যাঁটা ইত্যাদি দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলে পড়ল হেযবুত তওহীদের গুটিকয় সদস্যের বাড়িগুলোর উপর। একে একে তাদের আটটি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল। কয়েকজনকে মেরে মারাত্মকভাবে আহত করা হল। ঘেরের শত শত মণ মাছ লুট করে নেওয়া হলো। অবশিষ্টগুলো বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হল, নষ্ট করে দেওয়া হল ফলদায়ী বৃক্ষ, কেটে নেওয়া হল খেতের পাকা ফসল। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, গোলার ধান সব লুটপাট করা হলো। **কয়েক ঘণ্টা ধরে আক্রমণ পরিচালনা করার পর আমাদের আহত রক্তাক্ত মুমূর্ষু নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ শিশুদেরকে পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে থানায় নিয়ে গেল। এরপর ষড়যন্ত্রকারীদের যোগসাজশে আবারও আমাদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করল স্থানীয় প্রশাসন। কোলের শিশু থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধাকেও মাসের পর মাস কারাগারে থাকতে বাধ্য করা হল।**

মিথ্যা মামলা দিয়ে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে বন্দী করে এবার তাদের বাড়িঘর ও জমিজমাগুলোকে তারা দখল করে নেওয়ার পাঁয়তারা কষতে লাগল। দীর্ঘ চার মাস কারাবন্দী থাকার পর তারা নিজ এলাকায় যেতে পারেন না। এখানে ওখানে দীর্ঘকাল মানবেতর জীবনযাপনের পর মহামান্য হাইকোর্ট জেলা প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন হেযবুত তওহীদের ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদেরকে পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য। সে মতে পুলিশের এস পি'র মধ্যস্থতায় স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চিহ্নিত ষড়যন্ত্রকারীরা সোনাইমুড়ি থানার ওসি'র কার্যালয়ে বসে লিখিত

এভাবে একে একে সকল সদস্যকে আহত ও রক্তাক্ত করা হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

মুচলেকা দিয়েছিল যে তারা আর কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করবে না। এরপর হেযবুত তওহীদের সদস্যরা আড়াই বছর নির্বাসিত থাকার পর নিজ নিজ বসতভিটায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাদের ভস্মীভূত গুড়িয়ে দেওয়া বাড়িঘরগুলোকে আবার মেরামত করেন। জায়গা-জমিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে থাকেন।

এই একটি ঘটনারও বিচার হয়নি, একটা টাকাও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। বারবার লুটপাট ধ্বংসযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ করে আসামিরা পার পেয়ে গেছে। তারা মনে করেছে তারা যতই অন্যায় করুক তাদের কিছুই হবে না। এই অহঙ্কারে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা তাদের ষড়যন্ত্রের পরিধি বাড়াতে থাকে এবং আরো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করতে থাকে।

ইতোমধ্যে দেশব্যাপী আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, মাদক, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোর'আন হাদিস থেকে যুক্তি দলিল প্রমাণ তুলে ধরে সরকারের যথ যথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে দেশব্যাপী জনসভা, সেমিনার, পথসভা, প্রজেক্টর দিয়ে প্রামাণ্যচিত্র ও ভাষণ প্রচার ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে যাচ্ছিলাম। আমাদের সেসব বক্তব্য পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই, ইউটিউব, ফেসবুকসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে নোয়াখালী জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার অনুমোদন নিয়ে আমাদের বাড়ির নিকটবর্তী ইউনিয়ন কার্যালয়ের সামনে জঙ্গিবাদবিরোধী একটি সমাবেশ করি। এরপর নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করে জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য আমাদের বাড়ির আঙিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিই। এই মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী ও গ্রামের পূর্বশত্রুরা শুরু করল নতুন ষড়যন্ত্র। **নির্মাণকাজ শুরু হতেই মসজিদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ হয়ে গেল। বলতে লাগল যে, আমরা নাকি এখানে মসজিদ নয়, গির্জা বানাচ্ছি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও অপপ্রচার চালাতে শুরু করল ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি। মূলত আবারও আমাদের বাড়িতে হামলা চালানোর জন্য পটভূমি রচনা করতেই তারা আবারও অপপ্রচার শুরু করল।** দক্ষিণ পাড়া (ভুঁইয়াবাড়ি) জামে মসজিদের মধ্যে গাজীপুর থেকে জনৈক মুফতিকে ভাড়া করে এনে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্যও দেওয়ালো। তারপর তারা একটি নাম-ঠিকানাবিহীন মিথ্যা হ্যান্ডবিল রচনা করল। তাতে আমাদের বইয়ের বিভিন্ন বক্তব্যকে খণ্ডিতভাবে তুলে

প্রচণ্ড আহত ও রক্তাক্ত মৃতপ্রায় একজন সদস্য। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

তার ইচ্ছামাফিক বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো এবং বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হলো, আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করা হলো। এক জুমার দিন মোটর সাইকেলে করে টুপি পাঞ্জাবী পরা কতিপয় যুবক আটটি মোটর সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে গ্রামের আশে পাশে মসজিদে মসজিদে গিয়ে সেই হ্যান্ডবিলটি ছড়িয়ে দিয়ে আসল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিনরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন হ্যান্ডবিলটি জুমা পড়তে আসা মুসল্লীদের পড়ে শোনানোর জন্য। পড়ে শুনিয়ে তারা জনগণকে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। তারা একবারও খতিয়ে দেখলেন না, এই বেনামী উড়ো হ্যান্ডবিল - নাম নেই, ঠিকানা নেই, কোথা থেকে এসেছে, কারা এনেছে, কী হতে পারে এর পরিণতি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে আমরা দৌড়ে থানায় গেলাম জিডি নিয়ে। কারণ ২০০৯ সালের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কার্যকরী কোনো পদক্ষেপই নিলেন না। পরদিন নিরুপায় হয়ে আমরা দৌড়ে গেলাম পুলিশ সুপারের কাছে। কিন্তু পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে নিতেই শুরু হয়ে যায় হামলার

ধারালো তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে একজন সদস্যের হাতের আঙ্গুল কেটে নেয়া হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

আয়োজন।

আসে ১৪ মার্চ ২০১৬। অপপ্রচারে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেওয়া হলো একটি আওয়াজ - খ্রিষ্টান মারো, গির্জা ভাঙো। আশেপাশের কওমী মাদ্রাসাগুলো থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এনে মিছিল করানো হলো। শিক্ষকদেরকেও আনা হলো সহিংসতায় ইন্ধন যোগানোর জন্য। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাডাররা এতে সশস্ত্র অবস্থায় যোগ দিল।

সকাল থেকেই নির্মাণাধীন মসজিদটি ভাঙার জন্য তারা মিছিল নিয়ে দলে দলে আসতে লাগল। শুরু করল হেযবুত তওহীদের মসজিদ নির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আসা নির্মাণশ্রমিকদেরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ। তাদের হাতে লাঠিসোটা, কিরিচ, গরু জবাই করা ছুরি, লোহার রড ইত্যাদি। ইতোমধ্যেই আমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তবে যারা বাইরে ছিলেন তারা

আমাদের পুরো বাড়িটি, দশ-বারোটি মোটর সাইকেল, ভ্যানগাড়ি, আসবাবপত্র, গবাদিপশুসহ সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

এভাবেই হাতে তরবারি-রড ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্যে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

দুইজন হেযবুত তওহীদের সদস্যকে জবাই করে হত্যা করে চোখ তুলে ফেলা হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

তখনও টেলিফোনে চেষ্টা করে চলেছেন প্রশাসনের কাছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরতে।

চারদিক থেকে যখন পাথরবৃষ্টি শুরু হলো এবং মসজিদের ইটগুলো ভেঙে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল, নিরস্ত্র নির্মাণশ্রমিক ও হেযবুত তওহীদের সদস্যরা আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু হাজার হাজার উন্মত্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার থাকে না। তাছাড়া তখন যদি আত্মরক্ষার জন্য কিছু করাও হত, সেক্ষেত্রে হেযবুত তওহীদকেই দোষারোপ করা হত। হামলাকারীরা ক্রমাগত ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে বৃষ্টির মতো। একে একে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা আহত হতে শুরু করে। মাথা ফেটে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত লেগে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। **তখনও কিন্তু প্রশাসনের কোনো হস্তক্ষেপ নেই।** আক্রমণকারীরা আগুন ধরিয়ে একে একে বসতবাড়িগুলো পুড়িয়ে দেয়। **পার্শ্ববর্তী আব্দুস সোবহানের আধাপাকা বাড়িটি**

এভাবেই দুজন মোমেন মুসলমানকে শুধু মিথ্যা গুজবের উপর ভিত্তি করে জবাই করে চোখ তোলা হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। মসজিদ নির্মাণ করতে আসা দুইজন সদস্যকে হাতের নাগালে পেয়ে আমাদের বাড়ি থেকে টেনে হেঁচড়ে আব্দুস সোবাহানের বাড়ির পুকুর পাড়ে নিয়ে ঝোঁপের পাশে গরু জবাইয়ের ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। তাদের হাত পায়ের রগগুলো কেটে ফেলে, তারপর চোখ উপড়ে নেয় ছুরি দিয়ে। লাশ বিকৃত করার পর তা পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এরই মধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু আক্রমণকারীরা তার কোনো তোয়াক্কাই করে না। তৎকালীন থানা পুলিশও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এই হত্যাযজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য তারা পাগলের মতো যে যেভাবে পারে সন্ত্রাসীদেরকে আহ্বান করতে থাকে। ঢাকা-নোয়াখালী সড়কের বাস থামিয়ে বাসের যাত্রীদেরকে পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলে হামলায় অংশগ্রহণের জন্য উত্তেজিত করা হয়। ফেসবুকে তারা উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। বলতে থাকে, দুজন খ্রিষ্টানকে আমরা হত্যা করেছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে হামলায় অংশ নিতে আসার জন্য ফেসবুকে আহ্বান করতে থাকে। ওই আইডিগুলো ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পরিচালনা করে থাকে, যার স্ক্রিনশট আজও আমাদের কাছে রয়েছে। সারাদিন দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম- গুলোতে এই সংবাদ লাইভ সম্প্রচারিত হতে থাকে। সারা দুনিয়ার মানুষ দেখেছে এই নারকীয় পৈশাচিক ঘটনা। এরই মধ্যে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশেষ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে আব্দুস সোবহানের বাড়ি পেরিয়ে আমাদের বাড়িটিতেও লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি মোটর সাইকেল, একশ মন গোলার ধান, আসবাবপত্র, গবাদী পশুসহ বহু সম্পদ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এক ফোঁটা পানি দিয়েও কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেনি, যদিও এই নিষ্ঠুরতা দিনের বেলায় সবার চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। এক পর্যায়ে উর্ধ্বতন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ শুরু হলে এবার তারা গাছ কেটে সড়কে অবরোধ দেয়, থানায় হামলা চালায়। প্রশাসন-সরকার তখন উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, হামলাকারীদের উদ্দেশ্য অনেক বড়। তারা দেশে একটি বড় ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে যার ইস্যু হিসাবে হেযবুত তওহীদকে ব্যবহার করছে মাত্র। তখন

জবাই করে হত্যা করার পর লাশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য লাশের উপরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। (১৪ মার্চ ২০১৬ খ্রি.)

তারা এই সহিংসতা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। যাহোক, অবশেষে সম্মিলিতভাবে বিজিবি, দাঙ্গা পুলিশ, র‍্যাব ইত্যাদি বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। **ততক্ষণে আমাদের দুইটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেছে, মসজিদ নির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রমে অংশ নেওয়া দুইজন সদস্য প্রাণ হারিয়েছে, বহু আহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছেন, কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো সমস্ত শরীর রক্তাক্ত-জখম। এই আহত, বৃদ্ধ, মৃতপ্রায় মানুষগুলোর বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দিয়ে পরদিন জেলা কারাগারে তারা প্রেরণ করে। এক গ্লাস পানি পর্যন্ত তাদেরকে খেতে দেওয়া হয়নি।** দুই মাস হাজতবাসের পর তারা আদালতের সিদ্ধান্তে মুক্তিলাভ করেন, যদিও তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আড়াই বছরে এই মামলার কোনো অগ্রগতি হয় নি। আসামিরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে, হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াত আর হুমকি দিত এই বলে যে, দুইজনকে জবাই করেছি, আরো যারা আছে সবাইকে জবাই করব। কেউ আমাদের কিচ্ছু করতে পারবি না। অবশেষে ২০১৮ সালের নির্বাচনের কয়েকদিন আগে তড়িঘড়ি করে একটা চার্জশিট দেয়া হয়। সেই চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত আসামীরা একে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বলে আখ্যা দিয়ে সহজেই জামিনে মুক্তি পায়। কিন্তু পুলিশবাদী মামলায় যাদেরকে আসামি করা হয়েছে সেখানে আমাদের কোনো বক্তব্য পেশ করার সুযোগ থাকে না। অধিকন্তু সেই একই মামলা পুলিশ হাস্যকরভাবে আমাদের সদস্যদেরকেও আসামি তালিকাভুক্ত করেছিল। অর্থাৎ আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়েই একই মামলার আসামি। কী হাস্যকর! আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের দুটি নির্দোষ নিরপরাধ সদস্যের লাশ নিয়েও অপরাজনীতি করা হয়েছে। বহু প্রকৃত অপরাধীকে পরিচয় না জানার কারণে সেই সময় চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। সেই অপরাধীদের পরিচয় এখন বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ হচ্ছে। আমরা আশা করব অতি শীঘ্রই তারাও আইনের আওতায় আসবে।

আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে,"বার বার এই জায়গায় হামলা করা হয় কেন?" এর প্রথম জবাব হচ্ছে, এই বাড়ি হেযবুত তওহীদের এমামের বাড়ি। হেযবুত তওহীদের এমাম ধর্মব্যবসা, সাম্প্রদায়িকতা, গুজব, হুজুগ, ধর্মোন্মাদনা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরে সবচেয়ে সোচ্চার অবস্থানে আছেন। স্বভাবতই তারা দলীয় প্রধানের বাড়ি হিসাবে এই স্থানকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় বিরোধী ও পারিবারিক পূর্বশত্রুদেরকে পেছন থেকে উসকে দিচ্ছে হেযবুত তওহীদের আদর্শিক প্রতিপক্ষ কিছু ইসলামিক নামধারী রাজনৈতিক দল। তারা হ্যান্ডবিল রচনা করে,

সন্ত্রাসী ক্যাডার সরবরাহ করে, মুফতি ও বক্তা ভাড়া করে অপপ্রচার চালিয়ে ঘটনাগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। তৃতীয়ত কিছু চিহ্নিত ধর্মব্যবসায়ীর জঘন্য অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে গ্রামের চিহ্নিত কয়েকটি পরিবারের সন্ত্রাসী প্রকৃতির সদস্যসহ ধর্মব্যবসায়ীদের কিছু অন্ধ অনুসারী আমাদেরকে হামলাগুলো করে থাকে, এবং তা বারবার। সম্মানিত সুধী! আল্লাহ আপনাদেরকে চোখ দিয়েছেন, কান দিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। চিলে কান নেওয়ার মতো কানকথায়, গুজবে কান না দিয়ে আপনারা আসুন - দেখুন। বিশটি বছর ধরে তারা অপপ্রচার করেছে যে, আমরা নাকি খ্রিষ্টান। **যে মসজিদটিকে তারা গির্জা আখ্যা দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের এ গুজবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দুই জন শহীদের রক্তের বিনিময়ে এখন সেখানে তিনতলা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।** সেখানে আজান দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হচ্ছে, জুমার নামাজ হচ্ছে, ঈদের জামাত হচ্ছে। সেখানে প্রায় প্রতি জুমায় এক হাজারের বেশি মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ পড়েন। নিচতলায় শিশু কিশোরদের কোর'আন শিক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়ার জন্য মক্তব পরিচালনা করা হচ্ছে। বয়স্কদের জন্য রয়েছে সান্ধ্যকালীন শিক্ষা কার্যক্রম। আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা নিজেরা এসে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজেদের চোখেই দেখুন - আমরা কী করি বা করছি। নিজ কানে শুনুন - আমরা কী বলি। ইনশা'আল্লাহ প্রমাণিত হয়েছে এবং হবে যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে এতদিন নানা কথা ছড়িয়েছে তারা মিথ্যাবাদী। তারা এসব করেছিল আমাদের জায়গা সম্পত্তি দখল করার জন্য।

কিন্তু আল্লাহর রহমে আমরা তাদের অন্যায়ের কাছে হেরে যাই নি। আমরা আবারও চেষ্টা করছি নিজেদের যতটুকু সহায় সম্পত্তি, শিক্ষা ও সামর্থ্য আছে সেটুকুর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের গ্রামকে একটি উন্নত আদর্শ গ্রামে পরিণত করার জন্য। তারা আমাদের পুকুর ও

নির্মাণাধীন পাঁচতলা মসজিদের তিনতলা সমাপ্ত। (২০২০ খ্রি.)

উৎপাদিত মাছ। (২০২০ খ্রি.)

ঘেরের মাছ লুট করে নিয়েছিল, তারপর বিষ ঢেলে বাকি মাছ মেরে ফেলেছিল। আমরা সেই সব পুকুরে ও গ্রামের পতিত জলমহালগুলোকে যথাযথ বিধি মেনে লিজ নিয়ে আবারও মাছের চাষ করছি। অল্প জমিতে অধিক মৎস্য উৎপাদনের জন্য বায়োফ্লোক পদ্ধতির মৎস্য প্রকল্প তৈরি করেছি। তারা আমাদের গোলার ধান আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, আমরা পুনরায় সকল জমিতে ধান ও শাক-সবজির আবাদ করছি। তারা আমাদের

সবজি প্রকল্পের লাগানো লাউ। (২০২০ খ্রি.)

পোরকরায় স্থাপিত হাঁসের খামার। (২০২০ খ্রি.)

ফলজ বৃক্ষ কেটে ফেলেছিল, আমরা আবার বৃক্ষ রোপণ করছি। অপসংস্কৃতি ও মাদকের কালোথাবা থেকে গ্রামের তরুণ সমাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে এবং বেকারত্ব থেকে মুক্তি দিতে আমরা তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। এর অংশ হিসাবে পোশাক তৈরির কারখানা ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছি। তারা আমাদের গবাদি পশুগুলোকে লুট করে নিয়েছিল। আজ আমরা অর্গানিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ খামার দিয়েছি যা বিগত কোরবানির ঈদগুলোতে সুস্থ-সবল কোরবানির পশু সরবরাহের জন্য এলাকার মানুষের কাছে খ্যাতি কুড়িয়েছে। আগামী প্রজন্মকে আধুনিক ও নৈতিক উভয় প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করছি একটি উচ্চ বিদ্যালয়। এক কথায় আমরা ধ্বংসের পরিবর্তে নির্মাণ, শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব, অশিক্ষার পরিবর্তে সুশিক্ষা, বেকারত্বের পরিবর্তে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। আমরা সেটার স্বাক্ষর রেখে চলেছি। আমাদের এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে গ্রামের উন্নয়ন, প্রগতি, সমৃদ্ধি আনয়ন ছাড়া আর কোনো অভিসন্ধি নেই। এ কথা ইনশাল্লাহ সময় গেলেই প্রমাণিত হবে।

আমাদের গ্রামের কেউ বলতে পারবে না আমরা এ পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি করেছি। বস্তুত এটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে এই যে বারবার হামলা চালানো হলো, তার কারণ আর কিছুই নয়- স্থানীয় কয়েকটি পরিবারের ষড়যন্ত্র এবং ধর্মব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা। আমরা ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে, মাদকব্যবসার বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে স্বার্থ হাসিলের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই তাদের রোষানলে পতিত হয়েছি। আমরা যা বলি নাই তা আমাদের নামে বলে

আটা, ময়দা ভাঙানোর কারখানা। (২০২০ খ্রি.)

বেড়িয়েছে, আমাদের বইয়ে লেখা বক্তব্যকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে। আমরা কিন্তু একবারও আইন হাতে তুলে নেইনি। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারতাম, সেটা আপনারা জানেন কিন্তু আমরা করিনি। কারণ দেশে একটা আইন আছে, সংবিধান আছে। ১৯৭১ সালে লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সেই স্বাধীন দেশে সার্বভৌম সরকার আছে, আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশ বাহিনী আছে, বিচারের জন্য বিচার বিভাগ ও আদালত আছে। তাই এখানে আমরা নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারি না। আইনের দৃষ্টিতে আমরা যেমন, অন্য যে কোনো নাগরিকও তেমন। কিন্তু আইন হাতে তুলে নিয়েছে ধর্মব্যবসায়ীরা কারণ তারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করে। আর আমরা বারবার আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। আমাকে দেশের সংবিধান যেখানে সংগঠন করার, আমার মতামত প্রকাশ করার, সমাবেশ করার, ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার, ধর্মীয় মতামত প্রচার করার অধিকার দিয়েছে সেখানে অপর কোনো নাগরিক আমার এই অধিকার চর্চায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এটা আমাদের মানবাধিকার, সামাজিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার। কারো দ্বারা যদি কোনো বে-আইনী কার্যক্রম হয়ে থাকে সেটা দেখার জন্য আইন-আদালত রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করে বারবার আইন হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে, আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। আমরা কিন্তু আইন ভাঙিনি। **আপনারা একটা কথা ভাবুন, আমি বার বার আক্রান্ত হচ্ছি আমার বাড়িতেই। হামলা করা হয়** (Place of occurrence) **আমার বাড়িতে। তাহলে আমার নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আমিতো সেই অধিকারও চর্চা করতে পারিনি। কারণ এটা করলেও অপপ্রচার চালানো হবে এই বলে যে, আমরা সন্ত্রাস করেছি, আমরা গ্রামবাসীর উপর হামলা করছি ইত্যাদি। তাই আমরা আত্মরক্ষাও করতে পারিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছি। কারা অন্যায় করেছে তাদেরকে আপনাদের আজ চিহ্নিত করতে হবে। তাদের বিচারের দাবিতে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে।**

আবারো তারা জোরেশোরে ওয়াজ মাহফিলের নামে অপপ্রচার শুরু করেছে, বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যা হ্যান্ডবিল রচনা করে সেগুলো বিতরণ করছে। আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করেন, রাতের বেলায় শীতকালে তারা ওয়াজ শুনতে যান। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, এতে তাদের সওয়াব হবে, পরকালে গুনাহ মাফ হবে। সে জন্য তারা কোর'আন হাদিসের বয়ান শুনতে যায়। ওয়াজের ময়দানের মতো ধর্মীয় পরিমণ্ডলকে ব্যবহার করে একটি গোষ্ঠী হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বানোয়াট কথা বলে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। যখন ঘটনা ঘটে যায় তখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে ছুটে আসে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক দলের নেতা গোছের মানুষগুলো। এদের সবার স্বার্থসিদ্ধির যাঁতাকলে পড়ে আমরা নির্দোষ হেযবুত তওহীদ বারবার হয়রানির শিকার হচ্ছি।

আপনারা তাদের অপপ্রচারের ব্যাপারে সজাগ থাকবেন, তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন, প্রতিবাদী হবেন - এটাই আমার অনুরোধ। যদি সোচ্চার না হন, তাহলে আজকে যারা সত্য কথা বলার জন্য, সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য আমাকে আক্রমণ করেছে, এ অন্যায় চলতে থাকলে কাল আপনিও তাদের আক্রমণের শিকার হবেন। পরশু আরেকজন আক্রান্ত হবেন। একটা পর্যায়ে দেশ সমাজ রাষ্ট্র কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না। গুজব, হুজুগ, ধর্মোন্মাদনা একটা দানবের মত। এই দানব প্রত্যেককে বিনাশ করে ছাড়বে। সেজন্য আমি বলব - আসুন, আমরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আল্লাহ রসুলের প্রকৃত শিক্ষা আমরা ধারণ করি, মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার তওফিক দান করুন। সর্বাবস্থায় ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, হকের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার তওফিক দান করুন। আল্লাহ হাফেজ।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ
গ্রাম ও পোস্ট: পোরকরা, থানা: সোনাইমুড়ী।
জেলা: নোয়াখালী।

যোগাযোগ: নিজাম উদ্দিন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ।
ঠিকানা: পূর্বোক্ত
ফোন: ০১৭৩৩৮৩৩৮১৬

ধ্বংসস্তূপের উপর আবারও চলছে নির্মাণ ও উৎপাদনের কাজ (২০২০ খ্রি.)

গুড়িয়ে দেওয়া মসজিদের স্থানে এখন গড়ে তোলা হয়েছে তিন তলা মসজিদ ভবন।

সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গরু মোটাতাজাকরণ খামার।

বেকারত্ব দূরীকরণে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পোশাক শিল্প কারখানা।

আগামী প্রজন্মকে আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করার স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠছে চাষীর হাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়।

জুমার নামাজ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য
নিজেদের অর্থ ও শ্রম দিয়ে নির্মাণ করছিলেন মসজিদ।
কিন্তু গুজব রটিয়ে দেয়া হয়েছিল, 'মসজিদ নয় গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছে'।
ব্যস, শুরু হলো তাণ্ডব, 'খ্রিষ্টান মারো - গির্জা ভাঙো'
শ্লোগান দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ।
কিন্তু বর্তমানে সেখানেই জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
তাদের সকল অপবাদ, প্রচারণা ও গুজব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২০১৬ সনের ১৪ মার্চ নির্মাণাধীন মসজিদটিকে গির্জা বলে গুজব রটিয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আর মসজিদের ইটগুলোকে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়।

জুমার খোতবা দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সেই মসজিদে বর্তমানে ৫ ওয়াক্ত নামাজসহ জুমার নামাজ কায়েম করছেন স্থানীয় মুসল্লিরা

**মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বারংবার হামলা,
অগ্নিসংযোগ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের ঈমানী কর্তব্য।**